মিল্টন বিশ্বাস ▷

শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি : প্রতিকার কী

গত বছর (২০১৪) বেশ কিছু ঘটনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শাস্তি প্রদানের বিষয়টিকে আলোচনার শীর্ষে নিয়ে আসে। বিশেষত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কিছু স্কুলের শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে এমপি-মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা জানাতে বাধ্য করা হয়। ছোট ছোট শিশুকে পেটে ক্ষুধা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে নিষিদ্ধ থাকলেও অনেক স্কুলে এখনো শিশুদের শাস্তি প্রদানের সংস্কৃতির অবসান ঘটেনি। বরং বেত্রাঘাতে অজ্ঞান হতে দেখা গেছে, চড় খেয়ে অপমানিত শিক্ষার্থী স্কুলে যাওয়া বাদ দিয়েছে। এসব ঘটনা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো বিদ্যমান। সেখানে এখনো শাস্তি সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা হলো, 'মারধর না করলে মানুষের মতো মানুষ বা জীবনে সফল হওয়া যায় না।' কিন্তু এটি এখন অচল রীতি। সময়ের পরিবর্তনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শাস্তি দেওয়ার রীতিকে 'না' বলার সময় এসেছে। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সুষ্ঠু, সুন্দর ও ভয়হীন পরিবেশ। শিশু ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল থেকে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেই যদি ভীতিকর পরিস্থিতির শিকার হয়, তাহলে তার জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। শিক্ষকদের প্রতি আস্থা না থাকলে শিশুরা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। তাই শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় পরিবেশ দরকার, যেখানে তারা সানন্দে জ্ঞান আহরণ করবে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে। শিশুদের সার্বিক বিকাশ বা উন্নয়নের অধিকার শিশু অধিকার সনদের অংশ। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বের শিশুদের মৌলিক মানবাধিকার, মর্যাদা রক্ষা, জীবনমান উন্নয়ন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং তাদের বিকাশের স্বার্থে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সনদটি গৃহীত হয়। ১৯৯৯-এর ১২ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে সনদটি কার্যকর হয়েছে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের ১৮ ও ১৯ ধারায় আইনি, প্রশাসনিক, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুরা যাতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ইনজুরি এবং কোনো ধরনের অন্যায় সুবিধাভোগীর শিকার না হয়, সে জন্য উপযুক্ত সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাষ্ট্রকে বলা হয়েছে। শিশুর ওপর সব শাস্তি বন্ধ করার জন্য এরই মধ্যে বাংলাদেশ সরকার বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ করেছে। এই নীতিমালা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) অন্য সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে। কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা শিক্ষা পেশায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পাঠদানকালে কিংবা অন্য কোনো সময় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে উল্লিখিত শাস্তিযোগ্য আচরণ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তা ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এসব অভিযোগের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫-এর আওতায় অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

বিধিবিধান জারি হওয়ার পরও শিক্ষার্থী নির্যাতন থেমে নেই। সারা দেশে ইউনিসেফ পরিচালিত জরিপে নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ৯১ শতাংশের মতে, বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটে থাকে। শাস্তি শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির বাইরেও শিক্ষার্থীকে হীনম্মন্য করে গড়ে তোলে, ফলে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। জরিপ থেকে জানা গেছে, বিদ্যালয়ে প্রায়ই শিক্ষকরা চপেটাঘাত, বেত্রাঘাত, কান টানা, চুল টানা, শরীর ধরে ঝাঁকুনি বা ধাক্কা দেওয়াসহ নানা শারীরিক শাস্তি দিয়ে থাকেন। অনেক সময় দেখা গেছে, সামান্য কারণে অপমান ও তিরস্কার করেছেন এবং অন্যদের সামনে ছোট করেছেন বা ভয় দেখিয়েছেন। ফলে শিক্ষার্থী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, শরীরে ইনজুরি বা পাঠে অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের প্রতি বিরক্তি, অপরাধপ্রবণতা বা ঝরে পড়ার হার বেড়ে গেছে। অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র মডেল। মানুষ তার সামাজিকীকরণের আসল শিক্ষাই অর্জন করে প্রতিষ্ঠান থেকে। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন, 'স্কুল তার পরিবার ও সমাজের মধ্যে একটা সেতু হিসেবে কাজ করে। ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে তাকে গড়ে তোলা স্কুলের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।' অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষ হলো শিক্ষার্থীদের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশের প্রাণকেন্দ্র।

শিক্ষকদের সদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ, তাঁদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, চালচলন শিশুর জীবনের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। নিষ্ঠাবান, কর্মঠ, দায়িত্বশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব তৈরিতে শিক্ষককেও হতে হবে নিষ্ঠাবান-নীতিমান ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন। সময়, পরিবেশ আর পারিপার্শ্বিকতা মানুষকে বদলাতে শেখায়। একটা সময় ছিল, যখন শিক্ষকরা ছাত্রদের বেত্রাঘাত করে শেখাতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই বদলায়। তবু এ যুগে গ্রামের অনেক স্কুল-মাদ্রাসায় কোনো কোনো শিক্ষক ছেলেমেয়েদের বেত্রাঘাত করে শিক্ষা দিচ্ছেন। সেই শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায়, সমস্যা সমাধানে এখনই তৎপর হতে হবে। সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি তা থেকে উত্তরণের বা সমাধানের পথও বাতলে দিতে হবে। ছাত্রদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে শিক্ষকদেরই। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে নিজেকে কত জ্ঞানী আর ব্যতিক্রমী হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, এ ব্যাপারটা শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি সেভাবেই গড়ে তোলা দরকার। শিক্ষক পড়ালেন না ঠিকমতো, ঘুমিয়ে গেলেন, দেরি করে এলেন, ফাঁকি দিলেন; তাহলে কি তাঁকে কোনো শাস্তি পেতে হয়। তাহলে বিনা কারণে পাঠদানের সময় কিংবা পড়া না পারার অজুহাতে শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের অধিকার তাঁর থাকে কি?

২০১১ সালে জারীকৃত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকায় তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। শাস্তি প্রদানের কারণে শিশুরা শারীরিক-মানসিক ক্ষতির শিকার হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে তার দায় বহন করতে হবে। সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজের কাছে পরিচিত করাতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা দরকার। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। উপরন্তু গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিলবোর্ড-ব্যানার-পোস্টার ও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে, যেন সর্বত্র শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার এবং জারীকৃত বিধি কার্যকর থাকে। তবে শিশুদের প্রতি অমানবিক আচরণ নিরসনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ জরুরি। কারণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই শিক্ষক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বকে মানবিক করে তুলতে সক্ষম হবেন। অবশ্যই ট্রেনিং প্রোগ্রামে শিশু মনস্তত্ত্ব পাঠ বাধ্যতামূলক করতে হবে। তাহলে পাঠদানের সময় শিশু মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে সক্ষম হয়ে সে অনুযায়ী আচরণ করবেন একজন শিক্ষক। সর্বোপরি অভিভাবকদের সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের আচরণ সম্পর্কে সন্তানরা কোনো অভিযোগ জানালে দ্রুত তা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে জানাতে হবে। তা ছাড়া নিজের সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে তাদের মানসিক অবস্থার নানা প্রান্ত। মূলত একজন ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার আগে তাঁর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতি সঠিক আচরণ সম্পর্কে যথার্থ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত বিশ্বে যেখানে মা-বাবারই শিশুদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার থাকে না, সেখানে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষকদের শাস্তি প্রদানের যে প্রবণতা, তা সত্যি আতঙ্ক জাগায়। এ জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তবে হয়রানির উদ্দেশ্যে কিংবা দলাদলির কারণে অন্যায় অভিযোগকারী সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
email: writermiltonbiswas@gmail.com

04 FEB 2015